স্রষ্টা, মানুষ ও ইচ্ছাশক্তি

আবদুর রউফ চৌধুরী

দুটি মানব মনের মিলনকে পাত্র ভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়; যেমন দুজন পুরুষ বা দুজন নারীর আন্তরিক সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব অথবা একজন নর ও একজন নারীর পরস্পর সামীপ্য ঘটে বিয়ের মাধ্যমে প্রেম-ভালোবাসার মিলনে, তেমনি, ইসলামিক পণ্ডিতদের মতে, ইসলামের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের নৈকট্যতা লাভ করা সম্ভব।

ঈশ্বরের সত্ত্বা নিরঙ্কুশভাবে একক, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনপেক্ষ। সবকিছুর অস্তিত্ব বা সত্ত্বা তাঁর উপর নীর্ভরশীল, কারণ তাঁর সমর্থন ব্যতিরেকে কোনওকিছুই অস্তিত্ব নিয়ে ঠিকে থাকতে পারে না। তিনি নিরন্তর পৃথিবীর ওপর প্রয়োগ করেছেন নিয়ন্ত্রণ; তাঁরই বদৌলতে সবকিছুর প্রকাশ, উপলব্ধি বা বোধ ঘটে। তিনি পরম দয়ালু, সর্বশক্তিমান, সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। স্বর্গ ও মর্তলোকের প্রত্যেক জিনিশের ওপর তাঁর প্রভুত্ব বিদ্যমান।[১] মানবমন যে বিষয়রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়, সে বিষয়রাজ্য সবই তাঁর দখলে, তাঁরই চৈতন্যসত্তায় বিধৃত, তাঁরই আশ্রিত, তাঁরই বিরচিত। তিনি সব জিনিশের স্রষ্টা, সবকিছুর অভিভাবক; তিনিই আশমান ও জমিনের মালিক।[২] তিনি স্বর্গ ও মর্তলোকের মালিক। স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান; কিন্তু স্থান ও কাল তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই ইচ্ছায় চালিত। তিনি একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ। তিনি আধার, আধেয়ও তিনি। তিনি আল্লাহ, তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি সৃষ্টি করেছেন সবকিছু– বিশ্বজগৎ, সৌরজগৎ, মহাজগৎ। আল্লাহ অনাদি, অনন্ত, সর্বতোভাবে এক ও অপরিবর্তনীয়, স্বয়ম্ভু ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি সৃষ্টি প্রবর্তন করেছেন, এরপর তিনি সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করেছেন, অবশেষে নিজের কাছে সবকিছু ফিরিয়ে নেন।[৩] তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, সংরক্ষক ও সহংহারকর্তা। বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিপালন, পরিপোষণ ও পরিচালনায় তাঁর কোনও সমকক্ষ নেই। তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিই হচ্ছে মানবজাতি। আল্লাহর নিরানব্বইটি সিফাৎ (গুণ) আছে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতি। আলোর প্রকাশক তিনি, তিনিই উদ্ভাসক।

আল্লাহ সবকিছুর মূল্যমান ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। তাঁর ইচ্ছা থেকে সবরকম মূল্যবোধ ও নীতিবোধ উৎপন্ন হয়েছে। 'দেখ! আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সে-ই মহান, যে আচরণের দিক থেকে সবচাইতে

[১] আল-কুরআন ৩ : ১৯০।
[২] আল-কুরআন ৪৯ : ৬৩-৬৪।
[৩] আল-কুরআন ৩০ : ১২।

উত্তম।'[৪] আল্লাহ প্রকাশ করেছেন মানবজাতির উদ্দেশ্যে দুটি আলো– মহাগ্রন্থ আল-কুরাআন ও মহামানব মুহাম্মদ (স.), যাঁর মাধ্যমে স্রষ্টা প্রদান করেছেন মহাসত্য– সত্যজ্ঞান। আল্লাহর অতিরিক্ত মহাতরঙ্গানন্দের লীলায়, মানবের প্রয়োজনে দুটি সত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে চিরন্তর সত্য ও জ্ঞানের চিরন্তর সৌন্দর্য। সত্যজ্ঞানের সাহায্যে মানবজাতি স্রষ্টার প্রেমে আপ্লুত হয়ে পরম সত্ত্বাকে ধারণা করতে সক্ষম, এবং মানবকার্পণ্য পরিহার করে মানব নিজেকে স্রষ্টার লক্ষ্যে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে ইচ্ছাশক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগে পুনঃমিলনের সহজ-সঠিক পথটি পর্যটন করতে পারে।

মানবের উপলব্ধির সুবিধার জন্য বিভিন্ন সংজ্ঞার দ্বারা স্রষ্টাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি; যেমন, তিনি অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন সত্ত্বা। তিনি জ্ঞানী– মহাজ্ঞানী, তিনিই বিধান। তিনি সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছেন আংশিকভাবে, আর মিলনাকাঙ্ক্ষায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সবসময়। তিনি মানুষকে দ্বৈতপাত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। একটি পাত্র পূর্ণ করেছেন নিজ সম্বন্ধীয় পরিপূর্ণ সত্য দিয়ে। মানবের অন্তরাত্মা যাতে সত্যালোর প্রকাশে স্রষ্টার নিমন্ত্রণে বিনয়নতশিরে তাঁর পদতলে উপস্থিত হতে পারে, পারে জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তৈরি করতে, আর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুসামগ্রী ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে। 'পড়, পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে– পড়, তোমার প্রভু অতি উদার ও দানশীল, যিনি মানুষকে সেই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।'[৫] আল্লাহ্‌র বাণী, সত্যজ্ঞানের প্রকাশ, মানুষের অন্তরে গভীরভাবে প্রবাহিত হয়ে মানবজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ মানুষকে পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন।[৬] আল্লাহ শিক্ষা দিলেন আদমকে 'সমস্ত বস্তুসামগ্রীর নাম, তারপর সেসব বস্তুসামগ্রী ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, আমাকে এগুলির নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হোও।'[৭] আল্লাহ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর বাহ্যিক পরিচয়, লক্ষণাদি আর গুণাবলী ব্যাপকভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন, শিক্ষাও দিয়েছেন। কুরআনে জ্ঞানকে তুলনা করার হয়েছে আলো ও দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে আর অজ্ঞতাকে অন্ধকার ও অন্ধত্বের সঙ্গে।[৮]

অপর পাত্রটি পূর্ণ করেছেন আইন দিয়ে, অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ যেমনি সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য তেমনি আইন জারী করেছেন মানবজাতির সর্বমঙ্গলের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আদমকে হুকুম করলেন, 'তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং এখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাকো, কিন্তু ওই বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।'[৯] এ নিষেধাজ্ঞার ফলে একথা স্পষ্ট যে, 'ওই বৃক্ষের' ফল না খাওয়াই ছিল এ-নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য; কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল, 'ওই বৃক্ষের কাছে যেয়ো না।' কোনও বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না-হলেও যখন এতে কোনও আশঙ্কা থাকে যে, সেবস্তু গ্রহণ করলে মানবজাতির অমঙ্গল সাধন হবে তখন বৈধবস্তুটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 'ওই বৃক্ষের' কাছে যাওয়া মানেই আনমনে তার ফল খেয়ে ফেলা আর এতে আদম (স.) ও হাওয়া (রা.) বিপদ আবশ্যক, ফলে তাঁরা অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তাই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল 'ওই বৃক্ষের' কাছেই যেন না যান। একথা মনে রাখতে হবে, 'সৃষ্টি তারই, নির্দেশও তার।'[১০] আল্লাহ সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিয়ম ও উদ্দেশ্যে।[১১] প্রকৃতিজগতের সবকিছুই নিয়মানুগ। কোনও বস্তু বা ঘটনা আপতিক বা আস্মিক নয়। প্রকৃতির সবকিছুই ঘটে

[৪] আল-কুরআন ৪৯ : ১৩।
[৫] আল-কুরআন ৯৬ : ৫।
[৬] আল-কুরআন ২ : ২৭০।
[৭] আল-কুরআন ২ : ৩১।
[৮] আল-কুরআন ৬ : ৫০, ১৩ : ১৭, ৩৫ : ১৯, ৪০ : ৫৮ ও ১৩ : ১৯।
[৯] আল-কুরআন ২ : ৩৫।
[১০] আল-কুরআন ৭ : ৫৪।
[১১] আল-কুরআন ২৭ : ২৩, ৪৯ : ১০, ২৫ : ২ ও ৬৫ : ৩।

নির্ধারিত নিয়মের অধীনে, নির্ধারিত পরিণতির পূর্বাভাস নিয়ে। প্রকৃতি বিশৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খল– প্রকৃতির সবকিছুই ঘটে কার্যকারণ নিয়মে, জাগতিক শৃঙ্খলা বাস্তবিকই একটি কারণিক নিয়মানুবর্তিতা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহ মানবজাতিকে দিয়েছেন সত্যজ্ঞান ও সত্য-আইন। সত্য এক। কোনও অবস্থায়ই একাধিক হতে পারে না, সত্য চিরন্তন। আদম (আ.)-কে প্রদত্ত সত্য আর মুহাম্মদ (স.)-কে প্রদত্ত সত্য এক ও অভিন্ন। সত্য মানববুদ্ধিপ্রসূত প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ, 'যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও ঈমানদার, তারা এও মান্য করে যা তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমার পূর্বে।'[১২] স্বাধীনচিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞান ও সত্যানুন্ধানের প্রতি আল্লাহর সমর্থন দ্ব্যর্থহীন। আল্লাহ সত্য-মিথ্যার পার্থক্র নির্বাচনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন মানুষের সুবিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর। মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন, এমনকি নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয় নির্ধারণে আল্লাহ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বিদ্বান ও বিবেকবান প্রতিটি মানুষের ওপর, পুরোহিতের ওপর না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে আইনের প্রয়োজন। সত্যে থাকতে পারে না কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব। কাজেই যে ধর্ম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে তা-ই হচ্ছে বাস্তব-সত্য। ইসলাম[১৩] বাস্তব-সত্য ধর্ম। ইসলামই প্রদান করেছে ব্যক্তি, সমাজ, সুনীতি, রাষ্ট্র– পার্থিব জীবনের সবকিছু সম্বন্ধে এক সর্বাত্মক বিধান। ইসলাম খণ্ডন করেছে অনিশ্চয়তা, আর উদ্ঘাটিত হয়েছে বাস্তব-সত্য। ইসলামই জাতি-বর্ণ-দেশ-কালের বৈষম্যবিবর্জিত সমগ্র মানবজাতির পরিপূর্ণ ধর্ম– সত্য ধর্ম, সর্ব ধর্মের নির্যাস।

ভ্রান্তিজনিত পাপের মূলোচ্ছেদ করেছে ইসলাম। অন্যান্য ধর্ম সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে শরীক করেছে বিভিন্ন শক্তিকে বা দ্বৈতবাদের প্রবর্তন করেছে বা সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয়তাকে অস্বীকার করেছে। সেখানে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ', অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোনও মা'বুদ নেই আর মুহাম্মদ (স.) স্রষ্টার প্রেরিত রাসূল।

ইসলামের অদৃষ্টবাদ নিয়ে অনেক অমুসলিম পণ্ডিত যে বাকবিতণ্ডার তুফান তুলেন তার মূলে রয়েছে কয়েক আলেমের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অভিমত, প্রতিকূল চিন্তাধারার প্রভাব। তাকদীর বিশ্বাসী হয়েও ইসলাম ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না। মানুষ তাকদীরের আয়ত্বাধীন। মানুষ আল্লাহ নয়, তবুও সে স্বাধীন। স্বাধীন এজন্য যে, স্রষ্টার গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে মানুষের মাধ্যমে, বিকাশের জন্যে স্বাধীনতার প্রয়োজন, তাই সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিয়েছেন নিজের ভালোমন্দ, উচিতানুচিত নির্ধারণ ও নির্বাচন করার ইচ্ছা-শক্তি ও ইচ্ছা-স্বাধীনতা। 'পরিষ্কার বলে দাও, এ মহাসত্য তোমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে। এখন যার ইচ্ছা মেনে নেবে, আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে।'[১৪] আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, মহাসত্য গ্রহণ করা বা না-করা মানুষের ইচ্ছাধীন, তবে 'যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে, তার গোমরাহী তার জন্যই ক্ষতিকর'[১৫]; কারণ, আল্লাহ মানবের ওপর কোনও কতৃত্বধারী নন্। মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন বলেই সে স্ব-ইচ্ছায় যা কিছু করে সেজন্য সেই দায়ী[১৬]; অবশ্য একদিন মানুষকে তার নিজ কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

স্বকীয় মঙ্গল সাধন করার পথে তাকদীর কোনওভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কী? নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতার জন্য তাকদীরকে দোষারূপ করা অনুচিত। যে-ব্যক্তি যে-জিনিশের আকাঙ্খা করেছে আল্লাহ তার জন্য তা সহজলভ্য করে দিয়েছেন। তিনি মানবকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আল-কোনআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে, 'সত্য এখন ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্ট; যে বিশ্বাস করতে চায় তাকে বিশ্বাস করতে দাও। এটা হবে

[১২] আল-কুরআন ৪ : ১৬২।
[১৩] টীকা: 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া।
[১৪] আল-কুরআন ১৮ : ২৯।
[১৫] আল-কুরআন ১০ : ১০৮।
[১৬] আল-কুরআন ১৭ : ৩৬।

তারই কৃতিত্ব। যে বিশ্বাস করতে চায় না, তাকেও তা করতে দাও। এটা ডেকে আনবে তারই দুর্নাম।'[১৭] সৃষ্টিকর্তা কোনও ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করেন না, শুধু 'তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল' আল্লাহও 'তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন'[১৮], কারণ, আল্লাহ ফাসিক লোকদের হিদায়ত করেন না; তাছাড়া যে-ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয় আর তার মানসে হেদায়তের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও ঈমানদার লোকদের নিয়মনীতির বিপরীতে চলে, তাকে আল্লাহ সেদিকেই চালান যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে।[১৯] এখন দেখুন, এসব আয়াত শরীফে বান্দার ইচ্ছা-স্বাধীনতা আর স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগকে কতখানি গুরুত্ব দান করা হয়েছে। ভাষা ও জাতীয়তার বিষয়ের উপর মানবজাতির কোনও ধরনের ইখতিয়ার নেই, যা ঈমানের অঙ্গ– এ হচ্ছে তাকদীরের প্রথম অংশ; আর তাকদীরের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে মানুষ 'বাস্তব কর্মজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত'[২০]; এক্ষেত্রে মানুষ 'সম্পূর্ণ স্বাধীন'[২১], তবে মানুষের কোনও কাজই আল্লাহর জ্ঞানসীমানার বাইরে নয়, কারণ এসব জ্ঞান 'আমার প্রভুর একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে'[২২]– যেখানে পরিচ্ছন্নভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 'আশমান ও জমিনে একবিন্দু পরিমান এমন কোনও জিনিশ নেই, না-ছোট না-বড়, যা তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে থাকতে পারে।'[২৩]

তাকদীর আর কিছুই নয়, যা হচ্ছে সৃষ্টজীবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্রষ্টার আগেভাগে লিপিবদ্ধ করা বাণী, কারণ, তিনিই শুধু একমাত্র ভবিষ্যদ্দর্শী, প্রাজ্ঞতত্ত্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। অবশ্য মানবের কার্যকলাপের নিয়ন্তা নয় তার তাকদীর, বরং নিয়ত ও তদবীরের উপর ফলাফল নির্ভরশীল, কারণ আল্লাহ 'কোনও জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করে।'[২৪] আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট মানুষকে দেখেন স্বতন্ত্রভাবে, কারণ তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বুদ্ধি, ইচ্ছা, বাচন ও ভারসাম্যের ওপর। 'কেউ অন্য কারো কৃতকর্মের জন্য দায়িত্বভোগী নয়।'[২৫] তাই মানুষ প্রত্যেকেই স্বীয় কার্যকলাপের উপর নির্ভরশীল; কর্মফলের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের আনন্দ উপভোগ বা দুর্ভোগ সঞ্চয় হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ হচ্ছেন পরমসত্তা ও মানুষের কল্যাণকর্তা, আর মানুষ হচ্ছে তাঁর পার্থিব প্রতিনিধি। আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণের গুরুদায়িত্ব নিয়ে, বুদ্ধি ও বিবেকের অধীকারী মানুষ আবির্ভূত হয়েছে পৃথিবীতে। আর স্রষ্টার ন্যায়-সত্য-সুন্দর-কাল্যাণের ইচ্ছাকে সমুন্নত রাখার জন্য এ-পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে সবরকম অন্যায়, অবিচার ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। মূলকথা হচ্ছে– 'রহমত'[২৬], 'রবুবিয়াত'[২৭] ও 'ইনসাফ'[২৮] তিনটি গুণের অধিকারী আল্লাহর মধ্যে যা অপরিবর্তনীয় তাকে স্থায়ী করবে মানুষ তার মধ্যে, যা ইসলামের দাবী।

নির্দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, সসীমের কল্পনা দ্বারা অসীমের ফিতরাতের পরিপূর্ণতার উপলব্ধি অসম্ভব জেনেও হৃদয়ঙ্গম করার অদম্য ব্যাকুলতা মাত্র। যাই হোক, আল্লাহর ফিতরাতের ওপর মানবের কর্তব্য হচ্ছে– আল্লাহপ্রদত্ত গুণাবলীর অংশ অর্জনের সাধানায় নিজেকে ব্যপৃত করা, যাতে ভারসাম্যতার উপর তার প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, অবস্থা ভেদে, নিজের দোষাগুলি মার্জিত বা অবনমিত করে।

---

[১৭] আল-কুরআন ২ : ২৫৬।
[১৮] আল-কুরআন ৬১ : ৫।
[১৯] আল-কুরআন ৪ : ১১৫।
[২০] শায়খ মোহাম্মদ আল-গাযালী, ইসলামী আকীদা, অনুবাদক- মুহাম্মদ মূসা, ১৩০ পৃষ্ঠা।
[২১] শায়খ মোহাম্মদ আল-গাযালী, ইসলামী আকীদা, অনুবাদক- মুহাম্মদ মূসা, ১৩০ পৃষ্ঠা।
[২২] আল-কুরআন ২০ : ৫২।
[২৩] আল-কুরআন ১০ : ৬১।
[২৪] আল-কুরআন ৭৪ : ৩৮।
[২৫] আল-কুরআন ১০ : ৪১।
[২৬] অতি কৃপা। – আ. র. চৌধুরী।
[২৭] প্রতিপালন। – আ. র. চৌধুরী।
[২৮] ন্যায় পরায়ণতা। – আ. র. চৌধুরী।

মানবের অমার্জিত-গুণাবলী সম্বন্ধে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– মানুষ আত্মম্ভরি ও অহঙ্কারী[২৯], অধিকাংশ মানুষ সত্যকে ঘৃণা করে[৩০], মানুষ বড় লোভী[৩১], মানুষ অত্যন্ত অবিচারী ও অকৃতজ্ঞ[৩২], মানুষ নিরাশায় হতাশ[৩৩], মানুষ হীনমনা[৩৪], মানুষ সম্পদ পেয়ে কৃপন[৩৫], মানুষ ধন লিপ্সায় উগ্র[৩৬] এবং মানুষ অকৃতজ্ঞ তার মা'বুদের প্রতি[৩৭]। এসব অমার্জিত-গুণাবলী মানুষের ইচ্ছাকৃত কার্যাবলীতে পরিণত হয়েছে, নতুবা আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের হওয়া উচিত ছিল প্রশংসিত, গুণান্বিত; কিন্তু আল্লাহপ্রদত্ত ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের ফলে ভারসাম্য হারিয়ে মানুষ হয়েছে দুর্বল[৩৮], অবিবেচক[৩৯] আর অধৈর্যশীল[৪০]; অর্থাৎ আপন কর্ম দ্বারা সৃষ্ট অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়েছে। উত্থানপতনের ক্ষমতা সৃষ্টিলগ্নেই দেওয়া হয়েছিল মানুষকে, 'হে মুসলমানগণ, তোমরা নিজেদের আত্মাকে নিজেদের জিম্মায় নেও, তোমাদের সকলকে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[৪১] একাজে সাহায্য করার জন্য প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে বিবেক, যাতে বলগাহীন অশ্বের মতো ইচ্ছাশক্তির তাড়নে মানব বিপথগামী না হয়, তাই স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরি। তার সঙ্গে অর্জন করা প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মপথ। প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজ-কর্মের চিন্তা করাই যথেষ্ট।

ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীন বিবেক বুদ্ধির বল্‌গা দ্বারা নিয়ন্ত্রণে এনে পরিচালিত করলে সৎকর্মের সাহায্যে আত্মার উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়। ঈমান নির্ধারিত হয় বুদ্ধিতে, আর ইচ্ছাশক্তির নির্ধারক শরীয়ত। শুরুতে প্রাপ্ত সহজাত গুণ এতে সহায়ক ও মানবের অপ্রাকৃতিক প্রকৃতির নির্দেশক। মানুষের এ-পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন, তার সূচনা, ধরন-ধারণ ও বিকাশ তাকে বিশেষ গুণে প্রভাবান্বিত করেছে। সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান ও স্বাধীন-ইচ্ছা মানবের উদ্ধারের উৎস। মানুষ যে-পাত্রকে শূন্য করে আল্লাহ তা পূর্ণ করেন, কারণ, 'করুণা করাই আল্লাহ কর্তব্য করে নিয়েছেন নিজের জন্যে।'[৪২] আল্লাহ ক্ষমাশীল[৪৩], প্রেমময়[৪৪], পরম দয়ালু[৪৫]।

মানুষের আরেকটি শক্তি হচ্ছে বাকশক্তি, কারণ, মানুষকেই সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টার প্রতিনিধিরূপে।[৪৬] মুক্তির সহায়ক হিশেবে বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে বাকশক্তিরও উপযুক্ত স্থান দান করা হয়েছে। বাকশক্তি স্বর্গীয় ও মানবীয় কাজে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তার বিষয়বস্তু বুদ্ধি সম্পৃক্ত; যদিও তা অশরীরী তথাপি বহন অক্ষম মানুষের ইচ্ছা ও বোধগম্যের জন্য; যদিও বাহ্যিক বাহক তবুও অন্তরের চিন্তা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারূপ ধারণ করে। কাজেই মানবের আরাধনা বা সালাতের– উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত– ভাষাবিহঙ্গের মধ্যমে পৌঁছে দেয় স্রষ্টার কাছে। আক্‌ল, আখলাক ও আমল মানবের জন্যে মুক্তির দরজা খোলে দিতে পারে, যদি মানুষ বুদ্ধি দ্বারা সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে ইচ্ছাশক্তি ও বাকশক্তিকে, একাত্মবাদ উপলব্ধি করার জন্যে, আর দৃঢ় বিশ্বাসে নিজ অন্তরে জন্ম দেয় যে, এক আল্লাহর উপর সবকিছু নির্ভরশীল; তা হলে নেক আমল দ্বারা আল্লাহর কৃপা লাভে সক্ষম হওয়া যায়। তেমনিভাবে ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে ইসলাম; স্রষ্টার ইচ্ছার সঙ্গে সামাঞ্জস্য স্থাপন করার বাহন, সালাতের

[২৯] আল-কুরআন ১১ : ১০।
[৩০] আল-কুরআন ২৩ : ৭০।
[৩১] আল-কুরআন ৪ : ১২৮।
[৩২] আল-কুরআন ১৪ : ৩৪।
[৩৩] আল-কুরআন ৪১ : ৪৯।
[৩৪] আল-কুরআন ১৭ : ১০০।
[৩৫] আল-কুরআন ৭০ : ২১।
[৩৬] আল-কুরআন ১০০ : ৮।
[৩৭] আল-কুরআন ১০০ : ৬।
[৩৮] আল-কুরআন ৫ : ২৮।
[৩৯] আল-কুরআন ১৭ : ১১।
[৪০] আল-কুরআন ৭০ : ১৯।
[৪১] আল-কুরআন ৫ : ১০৫।
[৪২] আল-কুরআন ৬ : ৫৪।
[৪৩] আল-কুরআন ৮৫ : ১৪।
[৪৪] আল-কুরআন ৩৯ : ৫৩।
[৪৫] আল-কুরআন ২ : ৩৭।
[৪৬] আল-কুরআন ৬ : ১৬৫।

সাহায্যে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এ ধারণা করা অসংগত নয় যে, ইসলাম মানুষের কাছে পুনঃব্যক্ত করেছে বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও বাকশক্তির উপযুক্ত সংজ্ঞা ও তাদের সঠিক পথে প্রয়োগ। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট প্রেরিত ওহী দ্বারা স্রষ্টা বিশ্বমানবের জন্যে নাযিল করেননি নতুন কোনও জীবন পদ্ধতি। শুধু মাত্র পুরাতনকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন, পুনঃ অনাবৃত করেছেন পাত্রের প্রকৃত রূপ। 'এ তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি তোমাদের নামকরণ করেছিলেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও [কুরআনেও] তাই। যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ হন এবং তোমরা [মুসলমানরা] স্বাক্ষী স্বরূপ হোও মানব জাতির জন্যে।'[৪৭] অন্য কথায় বলা যায় যে, বেহেশতী জ্ঞানবুদ্ধি দানে মানবকে করেছেন তুখোড়। আর বাকশক্তি দ্বারা এনে দিয়েছেন বৈশিষ্ট্য। তদোপরি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যোগ্যতা দান করেছেন এ দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালনের জন্যে। কাজেই বিশ্বধর্ম ইসলামের শিক্ষানুযায়ী ইনসান– যদি মানব ভারসাম্য রক্ষা করে অনড় বিশ্বাসের সঙ্গে সালাত কায়েম করে, তাহলে প্রত্যাগমণে সে হবে পুরষ্কৃত। অবশ্য সত্য কাজ দ্বারা পুরষ্কৃত হবে। এবং তা হওয়ার জন্যে পুরষ্কার দাতার প্রতি আস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখা একান্ত প্রয়োজন, কারণ, 'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে তাদের জন্যে রয়েছে অবিচ্ছিন্ন পুরষ্কার।'[৪৮] তদোপরি আল্লাহ আহবান জানিয়েছেন মানবকে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কাছে আরজ পেশ করার জন্যে, 'হে মোমেনগণ! ধৈর্য ও সালাতের সাহায্যে করুণা প্রার্থী হোও।'[৪৯] আল্লাহ সহিষ্ণুদের সাথী। বান্দার সঙ্গী স্বয়ং আল্লাহ।

[৪৭] আল-কুরআন ২২ : ৭৮।
[৪৮] আল-কুরআন ৮৪ : ২৫।
[৪৯] আল-কুরআন ২ : ১৫৩।